আধুনিক যুগ: তাখরীজে ফিকহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ

যুগের বিবর্তন ও ফিকহী জটিলতা

বিশ্ব পরিবর্তনশীল। বিবর্তন আর পরিবর্তন নিয়েই বিশ্ব আর মহাবিশ্ব চলমান। পৃথিবী ক্রমাগত সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে সবকিছু। আমরাও ক্রমান্বয়ে বদলে যাচ্ছি। নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসরণ করে। আমরা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন অনুভব করতে পারি। আমাদের জন্ম থেকে ক্রমে বেড়ে ওঠা, দেহ-মন-মননে পরিবর্তন হওয়া; এ সবই পরিবর্তনশীল বিশ্বের একটি খণ্ডিত চিত্র। এভাবে প্রতিটি বস্তু রূপান্তর হয়। ফলে পরিবর্তন হয় বিশ্ব। আপন গতিতে; স্বীয় মাত্রায়। এ যেন কবির ভাষায়:

ہر دم رواں، ہر دم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی

বিশ্বের এ পরিবর্তন তার স্বভাব ও প্রকৃতি। এ পরিবর্তন অনিবার্য। হবেই এবং হতেই থাকবে। আল্লাহ তাআলা এভাবেই সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-মহাবিশ্বকে। দিনের পর রাত আসবে। মওসুম বদলাবে। কারো উত্থান হবে। আবার কারো পতন। কারো উন্নতি, অগ্রগতি। কারো 'হাল' অধোমুখী। এরূপেই সাজিয়েছেন তিনি এ জগৎটাকে। সদা চলমান পরিবর্তনই প্রমাণ করে যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী; দু'প্রান্তের অনস্তিত্বের মাঝে ভ্রাম্যমাণ এক অস্তিত্ব, যা এক সময় ছিলো না। আবার এক সময় থাকবে না। মাঝের কিছু দিন থাকবে তাও রূপান্তর হয়ে হয়ে এবং অস্থায়িত্বের চিহ্ন বহন করে। এ সবই ধ্রুব সত্য, সর্বজনবিদিত। আকীদা ও ইলমুল কালামের একটি প্রসিদ্ধ সূত্র আমরা সকলেই বারংবার শুনেছি এবং রপ্তও করেছি যে,

العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.

বিশ্বের এ পরিবর্তন কি ঠেকানো সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। কারণ এটিই তার নিয়ম, তার প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রবাহ স্থির রাখা যায় না। গতিরোধও করা যায় না। পেছনের দিকেও ফিরানো যায় না। সামনের দিকে যেতেই থাকবে। শিশু চিরকাল শিশু থাকে না। বড় হতে থাকে। এ বৃদ্ধিকে না দমানো যায়, না

পেছনের দিকে ফিরানো যায়। আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. সুন্দরই বলেছেন:

وقت کی گھڑی کو نہ تو اپنی جگہ روکا جاسکتا اور نہ اس کو معطل کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی اس کو ماضی کی طرف واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ (جدید فقہی مباحث، ۱/۶۰)

যে কোনো পরিবর্তনের একটি মাত্রা আছে। মাত্রা রক্ষা করেই পরিবর্তন আসে। এটিই সাধারণ নিয়ম। তবে কখনও কখনও মাত্রার ছন্দপতন হয়। অভূতপূর্ব বিবর্তন ঘটে যায়। সকল ধারণা আর পরিকল্পনাকে ভুল প্রমাণ করে একের পর এক ঘটতে থাকে সব কিছু। উত্থান-পতনের এ পৃথিবী এমন রূপান্তর ও বিবর্তন দেখেছে বহুবার। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তন যেন সব থেকে ভিন্ন, একেবারেই আলাদা। বিশ্ব আধুনিক হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। ক্রমে ও ঊর্ধ্বগতিতে। মানুষ একেকটি নতুন প্রযুক্তি দেখছে আর আশ্চর্য হচ্ছে, অবাক হচ্ছে। জাগ্রত থেকেও যেন নিজেকে স্বপ্নের জগতে আবিষ্কার করছে। এ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে শিল্প-বিপ্লবের হাত ধরে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) আরম্ভ হয় ব্রিটেনে। ক্রমান্বয়ে গোটা ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়ে। শিল্প বিপ্লবের ফলে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে সর্বত্র। প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পক্ষেত্র এবং সমাজের অগ্রগতিতে। যা এক সময় কল্পনাতীত ছিলো তা বাস্তবতার রূপ নেয় সে সময়কালে। সবকিছুতেই নতুনের ছোঁয়া লাগে। জন্ম নেয় নতুন নতুন যুক্তি আর আধুনিক প্রযুক্তি। আল্লামা ইউসুফ কারযাবী হাফিযাহুল্লাহ বলেন:

إن التطور طوال تلك العصور كان بطيئا، فقد كانت عجلة الحياة تكاد تسير على وتيرة واحدة، وكانت التغيرات التي تحدث في دنيا الناس ومعايشهم، أو في عقولهم وأفكارهم تغيرات جزئية، حتى كان الانقلاب الصناعي في الغرب الذي كان سببا في تغيير الحياة والمجتمعات تغيير بعيد المدى، عميق الجذور، فقد نتج عن استعمال الآلة في حياة الإنسان-بوساطة البخار والكهرباء ثم الذرة-تطور هائل في المجتمع البشري، نشأت عنه أوضاع ومشكلات لم تكن تخطر ببال الناس من قبل. (شريعة الإسلام صالحة للتطبيق، ص/٥٠)

নতুন বিশ্ব নবতর হয় বিংশ শতাব্দীতে। যা আজও চলমান। এ বিপ্লবকে আরো ত্বরান্বিত করে আধুনিক যুগ। জীবনযাপনের ধারা, উপায়-উপকরণ এবং সামাজিক রীতি-নীতি সবই আজ নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে। পেছনের

খোলস থেকে বেরিয়ে নতুন অবয়ব ধারণ করছে। কোনো কোনো পরিবর্তন তো নিছক শাখায় নয়; বরং মূলেই ঘটছে।

কর্মপদ্ধতির এ তারতম্য উদ্‌ভূত বিষয়ের তারতম্যের কারণে ঘটে থাকে। কেননা নবউদ্‌ভূত বিষয় সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। এক. পুরোনো কোনো বিষয় নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করা। এ প্রকারটিই বেশি। তামাদের সমাজে অজস্র এ রীতি-নীতি দেখতে পাই যা আজ আপডেট হয়েছে। অবয়বে নতুনত্ব এসেছে। দুই. যুগের পরিবর্তনের কারণে কিছু মাসায়িল নতুনরূপে সৃষ্টি হয়; যা পূর্বে ছিলো না। নতুন অস্তিত্বলাভ করেছে। যেমন: পূর্বে যানবাহন ছিলো না। তো ট্রাফিক আইনের প্রয়োজন ছিলো না। এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শুধু স্থলপথেই নয়; বরং জলপথে এবং আকাশপথেও ট্রাফিক আইন তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি *করোনা* বিশ্বকে আরও একটু নতুন করে তুললো। বিশ্বে নতুন পরিবর্তন আসছে বলে জ্ঞানী-গুণীরা পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছেন। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নতুনরূপে গড়তে বাধ্য করতে পারে এ *করোনা*। করোনার এ পরিবর্তনে ফিকহী বেশ কিছু বিধান আলোচনায় এসেছে। নতুন মাসআলা তৈরি হয়েছে। আবার পুরোনো মাসআলা নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। এ মাসআলাগুলোতে ফতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছে। প্রচারিত ফতওয়াগুলো দলীলসহ বারবার দেখলে বিষয়টি অনুমিত হবে বলে আশা করি। আমরা এখনো তালিবে ইলম। আমাদেরকে পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বোঝার সুবিধার্থে নিম্নে আলোচিত কয়েকটি মাসআলার শিরোনাম উল্লেখ করছি:

১. মসজিদে জামাআতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক কি না।

২. ঘরে জুমুআ আদায় করা যাবে কি না।

৩. জুমুআ আদায় না করলে যোহর একাকী পড়ব নাকি বা-জামাআত পড়ব।

৪. ঘরে ঈদের নামায বা-জামাআত আদায় করা যাবে কি না।

৫. আযানের মাঝেই 'আসসলাতু ফী বুয়ুতিকুম' বলা যাবে কি না।

৬. এক ফ্ল্যাটে থেকে অন্য ফ্ল্যাটের জামাআতে ইমামের ইকতিদা করা যাবে কি না।

৭. ঈদের নামায ঘরে একাকী পড়া যাবে কি না।

৮. ঈদের নামাযে খুতবা না দিলেও নামায সহীহ হবে কি না।

৯. ইযনে আমের ব্যাখ্যা কী হবে।

১০. কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো যাবে কি না।

১১. মাস্ক পরে নামায আদায় করা যাবে কি না।

১২. ইসলাম রোগ-ব্যাধির সংক্রমণকে সমর্থন করে কি না।

১৩. জানাযা ছাড়া দাফন করা যাবে কি না।

১৪. গোসল ছাড়া জানাযা পড়া যাবে কি না।

১৫. একাকী জানাযা পড়া যাবে কি না।

১৬. মায়্যিতকে তায়াম্মুম করিয়ে জানাযা পড়া যাবে কি না।

১৭. মুসাফাহা ও মুআনাকা করা যাবে কি না।

১৮. করোনার কারণে রোযা না রাখার রুখসত আছে কি না।

১৯. করোনার কারণে গরম পানির ভাপ নিলে রোযা ভেঙে যাবে কি না।

২০. প্লাজমা দেয়া-নেয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং প্লাজমা ব্যাংক তৈরি করা যাবে কি না ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআ স্থবির নয় বরং শাশ্বত ও সার্বজনীন

ইসলাম সর্বজনীন। ইসলামী শরীআও সর্বজনীন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআনুল করীমে উচ্চারিত হয়েছে,

{وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلنَاهُ تَفصِيلاً} [الإسراء: ١٢]

{وَنَزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَاناً لِكُلِّ شَيءٍ} [النحل: ٨٩]

ইসলাম চির আধুনিক বলেই যখনই যেখানে ইসলাম শাসন করেছে সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, উন্নত-অনুন্নত, আধুনিক-সেকেলে সর্বকালের ও স্থানের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান ইসলামে রয়েছে।

দীর্ঘ ১৪শত বছরের অভিজ্ঞতায় যা বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। এ দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় ইসলাম সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধ হয়েছে। পরিপুষ্ট হয়ে আরও সতেজ ও সজীব হয়েছে বর্তমান যুগের চাহিদা পূর্ণ করার সক্ষমতা নিয়ে। পৃথিবী যদি আরও আধুনিক হয়; প্রযুক্তি যদি আরও শতভাগ উন্নতি লাভ করে তবুও ইসলাম পিছিয়ে থাকবে না। তখনকার সমস্যার সমাধানেও সাবলীল ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে।

কারণ, ইসলাম যুগ ও যুগবাসী এবং পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর স্রষ্টার দীন। তিনি ইসলামী শরীআ নাযিল করেছেন। তিনি জানেন কখন কী ঘটবে, কখন কী পরিবর্তন হবে। সেরূপেই তিনি ইসলাম ও ইসলামী শরীআকে সাজিয়েছেন। সে সক্ষমতা দিয়েই প্রতিটি উসূল ও মূলনীতি স্থাপন করেছেন। যার দরুন ইসলাম ও শরীআ কখনই স্থবিরতার শিকার হয়নি। সামনেও হবে না। ইনশাআল্লাহ।

প্রাচ্যবিদরা (Orientalist) ইসলামী শরীআর সর্বজনীনতার মত বাস্তবতা মেনে না নিয়ে বরং তারা ষড়যন্ত্র করেছে। তারা বিভিন্নভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন (Ideological War) চালিয়েছে। মিশনারী শিক্ষা ও মিডিয়ার সাহায্যে সাধারণ মুসলিমদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, আধুনিক যুগে প্রাচীন শরীআ অচল। শরীআয় আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণ করার সক্ষমতা নেই। তাই আমাদেরকে শরীআ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি...।

অথচ শরীআ আজো সতেজ ও সত্য হয়ে বিদ্যমান। আজকের আধুনিক যুগের চাহিদাগুলো সাবলীলরূপে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। এবং মানুষকে সর্বাধিক সঠিক পথ প্রদর্শন করছে। এটি নিছক দাবি নয় বরং বাস্তবতা।

তাই পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথেই বলা যায় যে, ইসলামী ফিকহে মূলত কোনো স্থবিরতা নেই। জুমুদ নেই। হাঁ, কখনও কখনও হয়তো সমৃদ্ধির প্রবাহে ছন্দপতন হয়েছে। স্রোতের জোয়ারে ভাটা পড়েছে। কিন্তু কখনও থেমে থাকেনি। স্থবির হয়ে পড়েনি। মাওলানা যফর আহমদ আনসারী রাহ. বলেন:

میرا خیال ہے کہ فقہ اسلامی میں کوئی ایسی صورت نہیں واقع ہوئی جسے جمود کہا جاسکے، اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمیں مسئلہ پر چند پہلوؤں سے غور کرنا ہو گا۔

کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز ہمارے فقی مباحث میں دو سر گرمی اور گہما گہمی نہیں ہے جو ابتدائی ادوار میں تھی تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فقہ میں جمود ہے۔ (چراغ راہ، ص/۲۵۷)

মূল প্রবাহ কমে গেলেও স্রোত থেমে যায়নি কখনও। প্রত্যেক যুগে যখনই কোনো নতুন সমস্যা হাযির হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। সঠিক সমাধান বের করে মানুষকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। নতুন সমস্যার সমাধান দেয়ার যে ধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু হয়েছে তা আর থামেনি। এ প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. বলেন:

فقہ اسلامی میں حقیقے یہ کوئی جمود نہیں، اصول فقہ کے ماتحت ہرنئی ضرورت کے لئے قرآن وسنت سے احکام کے استنباط کا سلسلہ عہد نبوی سے لیکر قرون امت آخرہ تک ہمیشہ جاری رہا، اور ہے کہ آج بھی جاری ہے۔ (چراغ راہ، ص/۷۳۵)

কুরআন ও হাদীস ফিকহের মূল উৎস। আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। হাদীসসমূহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে উদিত করেছেন সর্বযুগের জন্য উপযোগী করে। এ ছাড়া ফিকহে এমন শক্তিশালী, সামগ্রিক নীতি ও উসুল তৈরি হয়েছে যে, যে কোনো সমস্যাকে তার আওতায় এনে সমাধান বের করা সম্ভব। তাই ইসলামী ফিকহে স্থবিরতা আসবে, তা হতেই পারে না; বরং তা সার্বজনীন ও সর্বকালীন। মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রহ. বলেন:

اسلامی اصول میں ہمہ گیری کی صفت ہے، جو اس کی ابدیت اور آفاقیت کی لئے ناگزیر ہے، اصول کی ہمہ گیری کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اصول ہر تہذیب میں جاری ہو سکتے ہیں، اور وہ ہر نئی چیز کی نوک پلک درست سکتے ہیں۔ (اسلام تغیر پذیر دنیا میں، ص/ ۸۱-۹۱)
آج بھی اسلام کو ایک تغیر پذیر دنیا سے واسطہ ہے مگر اصول اسلام کی ہمہ گیری آج بھی اسلام کو اتنی ہی مطابق زمانہ پینائے ہوئے جتنی ماضی میں بنائے ہوئے تھی۔(اسلام تغیر پذیر دنیا میں ص/ ۳۲-۴۲)

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞজনদের অসংখ্য বক্তব্য ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। তবে এখানে কয়েকজন উলামায়ে হিন্দের বক্তব্যের আলোকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে, ইসলামী শরীআয় কোনো স্থবিরতা নেই। নেই কোনো জুমুদ। বরং শরীআ চির ক্রিয়াশীল একটি জীবনবিধান। এখন আমাদের জানতে হবে যে,

শরীআর এ সতেজতা ও চিরস্থায়িত্ব কীভাবে অর্জিত হচ্ছে। কীভাবে শরীআ সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং উদ্‌ভূত সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা কীভাবে লাভ করছে?

ইসলামী শরীআ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে?

ইসলাম মদীনা থেকে নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ও উন্নত নগর শাসন করেছে। এমন নগরীও শাসন করেছে যেখানে পূর্ব থেকে একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো; কিন্তু নগরবাসী শরীআ ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে পূর্বের রীতিনীতি ত্যাগ করে ইসলামী শরীআকে গ্রহণ করেছে। শরীআ তাদের জীবনযাপনকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত। ভিন্ন সভ্যতা বা জীবনব্যবস্থার সামনে শরীআ কখনও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি: প্রকাশ করেনি নিজের অক্ষমতা বা স্থবিরতা। যত নতুন নতুন সমস্যা এসেছে শরীআ ততই সমৃদ্ধ হয়েছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিজের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছে।

শরীআ কীভাবে যুগের পর যুগ এমন সক্ষমতা অর্জন করেছে? কোন কোন মাধ্যম ধরে শরীআ সমৃদ্ধ হয়েছে? কেন শরীআ নব-সমস্যার সামনে মাথা নত করে না; নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে না বা স্থবির হয়ে থাকে না? এ প্রশ্নের উত্তর একজন ফিকহের তালিবে ইলমের জানা অপরিহার্য। বিশেষকরে বর্তমান যুগের ফিকহের তালিবকে। কেননা বর্তমানে নতুন নতুন আঙ্গিকে শরীআর উপর আক্রমণের চেষ্টা চলছে। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এর উপযোগিতা নিয়ে। শরীআ নিয়ে প্রাচ্যবিদ ও সেকুলারদের আরোপিত প্রশ্নাবলির বড় অংশের উত্তর নিহিত রয়েছে শরীআর সমৃদ্ধির পথ ও মাধ্যম বিষয়ক আলোচনার মাঝে। তাই এ দিকটি সবিস্তারে আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত।

যুগে যুগে শরীআ কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা যায়। বোঝার সুবিধার্থে সমৃদ্ধির মাধ্যমকে চার ভাগে আলোচনা করছি।

প্রথম মাধ্যম: অহী। **দ্বিতীয় মাধ্যম**: মুতলাক ইজতিহাদ। **তৃতীয় মাধ্যম**: মুকাইয়াদ ইজতিহাদ। **চতুর্থ মাধ্যম**: তাখরীজ।

মাধ্যমগুলো নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরছি।

এক. অহীর মাধ্যমে সমৃদ্ধি

ইসলামী শরীআর সূচনা এবং সমৃদ্ধির প্রথম ধাপ সুসম্পন্ন হয়েছে অহীর মাধ্যমে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তিন

পর থেকে ইসলামী শরীআর সূচনা হলেও মদীনা হিজরতের পর থেকে শরীআর সমৃদ্ধি ব্যাপকতা লাভ করেছে। মদীনার জীবনে নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অহী নাযিল হয়েছে। শরীআ বিষয়ে বিভিন্ন দিকনিদেশনা দেওয়া হয়েছে। মদীনার দশ বছর ধাপে ধাপে শরীআর মূলনীতিগুলো এবং উপস্থিত প্রয়োজনীয় বিধানাবলি পূর্ণতায় পৌঁছানো হয়েছে। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর এ ধারা বন্ধ হয়ে যায়। অহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শরীআর মৌলিক বিষয়ের সমৃদ্ধির ধারার ইতি ঘটে। এরপর যা সমৃদ্ধি হয়েছে তা মূলত ব্যাখ্যা ও শরীআ বাস্তবায়নগত বিষয়ে হয়েছে। তাই অহীর মাধ্যমে সমৃদ্ধি আর ইজতিহাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পার্থক্য আমাদের স্মরণ রাখতে হয়ে। অবশ্য এখন আর সরাসরি অহীর মাধ্যমে। শরীআতে সমৃদ্ধ করার কোনো অবকাশ নেই। তাই এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করছি না।

দুই. মুতলাক ইজতিহাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি

ইসলামী শরীআ সমৃদ্ধির দ্বিতীয় মাধ্যম হলো ইজতিহাদ। সরাসরি কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদ করে বিধান উদ্ঘাটন প্রক্রিয়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায়ই শুরু হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, তাঁর চলে যাওয়ার পর অহী বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের সমস্যার শেষ নেই। নিত্য নতুন বিষয় জন্ম নিবে। এমন ঘটনাও ঘটবে যার সমাধান কুরআন বা হাদীসে সরাসরি দেওয়া হয়নি। তাই তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা হাতে কলমে শিক্ষাও দিয়েছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুআয বিন জাবাল রা. কে ইয়ামানে পাঠান তখন বলেছিলেন:

"كيف تقضي؟" قال: أقضي بكتاب الله. قال: "فإن لم يكن في كتاب الله." قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: " فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم." قال: أجتهد رأيي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله." (رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 22061 و وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: ٢٣٤٤٢، والحديث قواه وصححه غير واحد من العلماء...)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ছিলেন ফকীহ সাহাবীদের অন্যতম। অনেক সাহাবী তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি

ইজতিহাদ করতেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তিনি কী নীতিমালা অনুসরণ করতেন তা এক বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে। একজন ফকীহর নিকট কোনো নতুন সমস্যা উপস্থাপিত হলে তার কর্মধারা কী হওয়া উচিত-এ বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন:

فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه، فليجتهد رأيه. (أخرج الإمام النسائي في <سننه الكبرى> (٩٢٢٢-ترقيم شعيب الأرناؤوط قال: هذا الحديث جيد جيد)

এভাবে মুজতাহিদ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন উপস্থিত সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। এ ধারা পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণও অনুসরণ করেছেন। তাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীআ সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেঈনের যুগে নাওয়াযিল তথা নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মুতলাক ইজতিহাদকেই বেছে নেওয়া হতো। তবে সে সময়ে কোনো কোনো সাহাবীর নিজস্ব ফিকহী হালাকাও তৈরি হয়েছিলো। প্রত্যেক হালাকার অনুসারীগণ সেই হালাকার সাহাবীর ইজতিহাদপদ্ধতিকে গুরুত্ব দিতেন। ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. বলেন:

لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة بذهبون مذهبه، ويفتون بفتواه، ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس. (العلل ومعرفة الرجال، 41)

এ ধরনের হালাকা ও মাযহাবভিত্তিক ফিকহ ও ইজতিহাদ চর্চার ধারা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে। প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মাধ্যমে যা চূড়ান্তরূপে পৌঁছে। চারও মাযহাবের নিজস্ব কিতাব সংকলন হয়। চার ইমামের শাগরিদগণ নিজেদের উসতাযের তরীকা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে ইজতিহাদ আরম্ভ করেন। এভাবে ইজতিহাদে মুতলাকের স্থানটি মুকাইয়াদ ইজতিহাদ দখল করতে থাকে। মাযহাব চতুষ্টয় যতই প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়েছে মাযহাবভিত্তিক ইজতিহাদ তথা মুকাইয়াদ ইজতিহাদের প্রচলন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সর্বোপরি সাহাবাযুগ থেকে ফিকহের চার ইমামের শেষ যামানা পর্যন্ত কমবেশি মুতলাক ইজতিহাদের চর্চাই হয়েছে। এর মাধ্যমে শরীআ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে মুতলাক ইজতিহাদের

মাধ্যমেই তাঁরা সমাধান নির্ণয় করা হয়েছে। যদিও কোনো ক্ষেত্রে মুকাইয়াদ ইজতিহাদের প্রভাব ছিলো। তবে মুতলাক ইজতিহাদের ধারা ছিল অগ্রগণ্য।

তিন. মুকাইয়াদ ইজতিহাদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি

চার ইমামের পর থেকে প্রায় চারশত হিজরী পর্যন্ত ইজতিহাদের উভয় ধারা তথা মুতলাক ও মুকাইয়াদ ইজতিহাদের চর্চা হয়ে থাকলেও ক্রমে ক্রমে মুকাইয়াদ ইজতিহাদই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সৃষ্ট নতুন সমস্যার সমাধানে নির্দিষ্ট ইমামের উসূল ও পদ্ধতির আলোকে ইজতিহাদ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। যেমন: যারা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর হালাকায় ফিকহ চর্চা করতেন তারা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা

রাহ. এর উসূল ও পদ্ধতিকে অনুসরণ করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য ইমামের ইজতিহাদপদ্ধতি কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে উসুল নির্ণয় করে উদ্ঘাটন করার প্রয়াস চালাতেন না।

এ সময়কালে প্রধানত নতুন সমস্যাদির ক্ষেত্রে ইজতিহাদে মুকাইয়াদকে অনুসরণ করা হতো। ফলে হাজারও নাযিলার সমাধান উদ্ঘাটিত হয়েছে এ পদ্ধতিতেই। এর মাধ্যমে শরীআ সমৃদ্ধি লাভকরেছে।

চারশত হিজরীতে যুগ ও আহলে যুগের অবক্ষয় ও অধঃপতনসহ যৌক্তিক নানা কারণে রক্ষণশীল ফিকহী

হালাকাগুলোতে মুতলাক ইজতিহাদ থেকে বিরত থাকা হয়। এবং প্রত্যেক মাযহাবেরর ফকীহগণ নিজ নিজ মাযহাবের আলোকেই ইজতিহাদ করবেন- এমন সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এরপর থেকে মুকাইয়াদ ইজতিহাদের ধারা ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যেক মাযহাবে মুকাইয়াদ ইজতিহাদের চর্চা হয় এবং এ পদ্ধতিতে অজস্র সমস্যার সমাধান বের করা হয়।

আব্বাসী খিলাফত এবং উসমানী খিলাফত এর সুদীর্ঘ সময়কালে অসংখ্য সমস্যা উদ্ভব হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম তার শরয়ী সমাধানও দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মাযহাবভিত্তিক মুকাইয়াদ ইজতিহাদ অনুসৃত ছিল। এ দীর্ঘকাল কল্পনা করলেও অনুমিত হয় যে, মুকাইয়াদ ইজতিহাদের চর্চা কেমন ব্যাপকতা লাভ করেছিলো। এবং ইজতিহাদের এ পদ্ধতির কারণে শরীআ কতটুকু সমৃদ্ধ হয়েছে। মুকাইয়াদ ইজতিহাদের এ ধারা থেমে যায়নি বরং আজও চলমান। ‘ইসলামী শরীআ স্থবির নয়; বরং শাশ্বত ও সর্বজনী’ এ শিরোনামে আমরা

ফুকাহায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য দেখে এসেছি, যারা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, শরীআয় কোনো স্থবিরতা নেই; আলোচ্য পদ্ধতির ইজতিহাদের মাধ্যমে শরীআর সক্ষমতা বেড়েই চলেছে।

বর্তমান আধুনিক যুগ। মানবজীবনের সমস্যাগুলোও আধুনিক। আধুনিক যুগের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও অনেক বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম ইজতিহাদের এ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। মুকাইয়াদ ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। অন্যরাও তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। বর্তমান যুগের সমস্যাবলির শরয়ী সমাধানের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে প্রসঙ্গে মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রাহ. প্রথমে চারটি পদ্ধতি উল্লেখ করে আলোচ্য পদ্ধতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

پانچویں صورت یہ ہے کہ ہر مکتب فکر، اپنی فقہ، اور اپنے اصول فقہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے، تغیر کے تقاضوں کو سمجھنے کی، اور ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کرے، اور یہ محنت کرنے والے حضرات مجتہ یہ منقسب ہوں گے، میرے ناقص خیال میں مسائل کے حل کی یہی ایک راہ قریب ترین، اور خطرات سے محفوظ راہ ہے۔ کیونکہ مجتند منتسب کے وجود کو مان لینے میں، یا کسی فرد و جماعت کو مجتہد منتسب تسلیم کرنے میں اول تو کسی تو کوئی اشکال نہیں ، کیونکہ ہر مکتب فکر تغیر پذیر دنیا کے تمام مسائل کا صحیح، یا ناقص حل پیش کرتا ہی ہے، اور روزانہ میسیون اجتہادات کرتا ہے، اگرچہ اجتہاد کا لف اسے گوارہ نہ ہو ۔ دوسرے جب چاروں مکاتب فکر مختلف نقطہائے نظر سے کسی معاملہ کو دیکھیں گے، تو مختلف احکام وجود میں آئیں گے، پھر جو مکتب فکر زیادہ نافع احکام وضع کرے گا۔ دوسرے مکاتب فکر ضرورت کے وقت اس کو اپنا لیں گے

মুফতী পালনপুরী রাহ. এ পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য আরও কিছু সুন্দর পরামর্শ যোগ করেছেন। মাদরাসার তালাবার মাঝে এ পদ্ধতির যোগ্যতা তৈরির লক্ষ্যে তিনি আহলে মাদারিসের খেদমতেও কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য (اسلام تغیر پذیر دنیا میں)

বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম থেকে এ পদ্ধতির স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও অনেকে এ পদ্ধতি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। যোগ্যতাসহ নানা ধরনের সমস্যার কথা ভেবে তারা তাখরীজে ফিকহীর পদ্ধতিকেই নিরাপদ মনে করেন।

চার. তাখারীজে ফিকহীর মাধ্যমে সমৃদ্ধি

মাযহাব চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর নাযিলার সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে তা হলো, তাখরীজে ফিকহী। তাখরীজে ফিকহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে:

استخراج حكم النازلة من نصوص المذهب وقواعده.

মাযহাবের মানসূস মাসায়িল বা কাওয়াইদ থেকে নাযিলার সমাধান বের করা। কোনো এমন নাযিলা দেখা দিলে যার সমাধান সাহিবে মাযহাব থেকে বর্ণিত নেই মাযহাবের বিজ্ঞ ফকীহগণ এ পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাধান স্থির করেন। প্রতিটি মাযহাবের ফকীহগণ নিজেদের মাযহাবকে সুসমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছেন-এই তাখরীজে ফিকহীর মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. বলেন:

فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج: وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وأعرفهم بأقوال القول وأصحهم نظرا في الترجيح، فيتأمل في كل مسألة وجه الحكم، فكلما سئل عن شيء، أو احتاج إلى شيء رأى فيما يحفظه من تصريحات أصحابه.

فإن وجد الجواب فيها، وإلا نظر:

1-إلى عموم كلامهم، فأجراه على هذه الصورة

٢-أو إشارة ضمنية لكلام، فاستنبط منها....

ونحو ذلك، فهذا هو التخريج. (حجة الله البالغة ٤٩٨/١)

মাযহাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে বিষয়ে সাহিবে মাযহাবের কোনো ব্যক্তব্য নেই সে বিষয়ের সমাধান প্রায় এ রূপেই বের করা হয়েছে। আমাদের মাযহাবে এ পদ্ধতিতে ব্যাপক কাজ হয়েছে। বিশেষকরে হানাফী মাযহাব যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রীয় মাযহাব ছিলো; অধিকাংশ কাযী ছিলেন হানাফী মাযহাবের। তাই প্রতিনিয়ত এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে যার সমাধান পূর্ববর্তী কোনো ইমাম থেকে অনুসৃত নয়। এ ধরনের সমস্যার সমাধান মাযহাবের ফকীহগণ তাখরীজে ফিকহীর মাধ্যমেই নির্ণয় করেছেন। এ প্রকার মাসায়িলের আধিক্যের কারণেই মূলত ফিকহে হানাফীর সংকলিত মাসায়িল তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ক. الأصول খ. النوادر গ. الفتاوى والواقعات। তৃতীয় প্রকারে ঐ সকল মাসায়িল সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলোর সমাধান ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। পরবর্তী ফকীহগণ ফিকহে হানাফীর উসূল,

নুসূস ও কাওয়ায়েদের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে সমাধান দিয়েছেন। আল্লামা ইবনে আবেদী শামী রাহ. (জন্ম ১১৯৮-মৃ.১২৫২হি.) এ প্রকার মাসায়িলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন:

هي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. (شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين رحمه الله : ٩١ مكتبة شيخ الإسلام)

অনেক ফকীহ ইমাম এ প্রকার মাসায়িলকে স্বতন্ত্ররূপেও লিপিবদ্ধ করেছেন। ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী রাহ (মৃ.৩৭৩) তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি মুখাররাজ সম্বলিত মাসায়িল একত্র করে 'কিতাবুন নাওয়াযিল' রচনা করেছেন। তিনি বলেন:

وأوردت في...(النوازل) : من أقاويل المشايخ وشيئا من أقاويل أصحابنا ما لا رواية عنهم أيضا في الكتاب ليسهل على الناظر فيها طريق الاجتهاد. (كشف الظنون: ١٢١١/٩)

পরবর্তী যুগে তাখরীজে ফিকহীর প্রচলন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মুতলাক ইজতিহাদের বিকল্প হিসেবে প্রায় সর্বক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন ফুকাহায়ে কেরাম। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুসতফা যারকা রাহ. বলেন:

الدور الفقهي الخامس من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع، في هذا الدور ركدت حركة الاجتهاد، وأخلد الراغبون في الفقه إلى العكوف على مذاهب أولئك المجتهدين السابقين... وفي النصف الأول من هذا الدور أفتى علماء المذاهب الأربعة بإقفال باب الاجتهاد...كان لكثير من فقهاء المذاهب في مرحلة هذا الدور اجتهاد مفيد محدود، أي آراء فقهية قائمة على أصول المذهب الذي ينتمون إليه... وقد حل هذا الاجتهاد المقيد محل الاجتهاد المطلق الذي كان في طبقة أئمتهم... (المدخل الفقهي العام، 183/1-186)

সার্বিক দৃষ্টিতে এ কথা বলাই যায় যে, বিগত এক হাজার বছর ব্যাপী ফিকহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই বিশেষ পদ্ধতির তাখরীজ। তাখরীজে ফিকহীর মাধ্যমে শরীআ ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। নতুন যুগে নতুন সমস্যা সমাধানে অনায়াস সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ পদ্ধতিতেই এক হাজার বা তারচে' বেশি সময় ধরে সমাধান দিয়ে আসছেন ফুকাহায়ে কেরাম। এ সময়ে যত নতুন মাসায়িল ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাবে যুক্ত হয়েছে তা মোটামুটি তাখরীজে ফিকহীর মাধ্যমেই যুক্ত হয়েছে। আজও যারা নাওয়াযিল বিষয়ে কথা বলছেন এবং সমাধান দিচ্ছেন তারাও কোনো না কোনোভাবে তাখরীজে ফিকহীর শরণাপন্ন হচ্ছেন। এর ভিত্তিতেই কথা বলছেন। সুতরাং মুখাররাজ

মাসায়িলের পরিমাণ মোটেই কম নয়। বরং আমরা সাধারণ ফিকহের যে কিতাবগুলো মুতালাআ করি তার বড় একটি অংশজুড়ে রয়েছে এই মুখাররাজ মাসায়িল। ফতওয়ার কিতাবগুলোতে এর পরিমাণ আরও বেশি। তবে যেহেতু মুখাররাজ মাসায়িল ভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করা হয় না; বরং সকল প্রকার ও শ্রেণির মাসায়িল একই ধারায় উল্লেখ করা হয় তাই এর সংখ্যাধিক্য দৃশ্যমান হয় না। সকল মাসায়িলকে একই প্রকার ও শ্রেণির মনে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবদুল হাই রাহ. বলেন:

ليس كل ما في الفتاوى المعتبرة المختلطة – كالخلاصة، والظهيرية، وفتاوى قضيخان، وغيرها من الفتاوى التي لم يميز أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره- قول أبي حنيفة وصاحبيه، بل منها ما هو منقول عنهم، ومنها ما هو مستنبط الفقهاء، ومنها ما هو مخرج الفقهاء. (النافع الكبير، ص/٢٠)

মাসায়িল উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এই পৃথকীকরণ না থাকায় মূলত আমরা মুখাররাজ মাসায়িলকে ভিন্ন করে দেখি না। স্বতন্ত্ররূপে বোঝার চেষ্টাও করি না। অথচ যে কোনো মাসআলাকে পূর্ণরূপে বুঝতে হলে অবশ্যই জানতে হবে যে, মাসআলাটি মাযহাবের মানসূস না কি মুখাররাজ। কারণ, মানসূস ও মুখাররাজ উভয়ের প্রকৃতি ও স্তর এক নয়।

বর্তমান যুগে তাখরীজে ফিকহীর চর্চা: গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পিছনের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, বিগত হাজার বছর ধরে তাখরীজভিত্তিক ফিকহের চর্চা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। আজও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে অজস্র সমস্যার সমাধান দেওয়া হচ্ছে। বিশেষকরে আধুনিক অনেক মাসায়িল এমন রয়েছে যার নযীর বিগত যামানার ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাবে পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রেও কিন্তু বিজ্ঞ ও দক্ষ মুফতিয়ানে কেরাম বসে নেই। তারা সমাধান প্রদান করে যাচ্ছেন। হয়তো তাখরীজ শিরোনাম উল্লেখ করছেন না। তবে কাজ করে যাচ্ছেন। যুগের চাহিদা পূরণ করছেন। ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ রাহ. তাখরীজে ফিকহীর গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন:

إن التخريج على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديث لكل منهما أصل أصيل في الدين، ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأخذون بهما، فمنهم من يقل من ذا ويكثر ومن ذاك... ومنهم من يكثر من ذا ويقل من ذاك، فلا ينبغي أن يهمل أمر واحد منهما بالمرة... (حجة الله البالغة ٥١١/١)

সুতরাং তাখরীজে ফিকহীকে অবহেলা করে ছেড়ে দেওয়া বা গুরুত্ব না দেওয়া মোটেই ঠিক হবে না। বরং নানাবিধ কারণে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায়

বর্তমানে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করা অপরিহার্য। অপরিহার্যতার কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরছি:

এক. ফিকহ বিষয়ে গভীরতা অর্জনের জন্য

দরসে নেযামীকে সাজানো হয়েছে ফিকহকে কেন্দ্র করে। তাই দরসে নেযামীর প্রতিটি জামাআতেই ফিকহ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তালীমুল ইসলাম কিতাব থেকে কিতাবুত তহারাত আরম্ভ হয়। এরপর প্রতি বছর কিতাবুত তহারাত সংশ্লিষ্ট আলোচনা কোনো না কোনোভাবে থাকেই। বেহেশতি যেওর, মালা বুদ্দা মিনহু, নুরুল ঈযাহ, মুখতাছারুল কুদূরী, কানযুদ দাকায়েক, শরহুল বেকায়া, হিদায়া পর্যন্ত প্রায় সকল কিতাবের কিতাবুত তহারাতের দরস প্রদান করা হয়। এরপর মিশকাতুল মাসাবীহ এবং দাওরাতুল হাদীসেও কিতাবুত তহারাত পড়ানো হয়। এভাবে প্রায় ১০/১২ বছর কিতাবুত তহারাত পড়ার পরও একজন মেধাবী তালিবে ইলম গোটা ফিকহ তো নয়ই কিতাবুত তহারাতে প্রাজ্ঞ হতে পারে না। সময় এবং শ্রম দুটোই ব্যয় হয়; কিন্তু কাঙ্ক্ষিত মালাকা অর্জিত হয় না। এর অন্যতম কারণ হলো, ফিকহ পড়া ও পড়ানোর ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি ও মানহাজ অবলম্বন না করা। মাসআলার ভিত্তি ও স্তরবিন্যাসকে যথাযথরূপে বিশ্লেষণ না করা। মুখাররাজ মাসআলার ক্ষেত্রে তাখরীজের তরীকা ও উজ্জ্বল সম্পর্কে অবগত না থাকা ইত্যাদি।

জানা কথা যে, মুখাররাজ মাসআলার দলীল সরাসরি কুরআন ও হাদীসে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে না। প্রথমে যে মাসআলার উপর ভিত্তি করে তাখরীজ করা হয়েছে সেই মাসআলার দলীল খুঁজতে হবে। সেই মাসআলার দলীলই মুখাররাজ মাসআলার দলীল বিবেচিত হবে। কোনটি মাযহাবের মানসূস আর কোনটি মুখাররাজ তা সাধারণত তালিবে ইলমের কাছে পরিষ্কার থাকে না। সে মুখাররাজ মাসআলার দলীল খুঁজতে থাকে কুরআন বা হাদীসে। পরে যখন সে খুঁজে পায় না তখন হতাশ হয়। কখনও কখনও মাযহাব বা ফুকাহায়ে কেরামের প্রতি আস্থাও হারিয়ে ফেলে। যেমন: আমাদের মাযহাবে একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা হলো, মায়ে কাছীর পরিমাপের সীমা স্থির করা হয়েছে ‘দাহ দর দাহ’ কে। কেউ যদি এই দাহ দর দাহ এর দলীল সরাসরি কুরআন ও হাদীসে খোঁজে, স্বাভাবিক কারণেই তা খুঁজে পাবে না। মাসআলাটির শরয়ী

ভিত্তি কী-তা বের করতেই সে হিমশিম খেয়ে যাবে। পেলেও অনেক অহেতুক তাবীলের আশ্রয় নিয়ে হবে। অথচ যদি বিষয়টি এভাবে দেখা হয় যে, এ মাসআলাটি মুখাররাজ। তাহলে প্রথমে মুখাররাজ আলাইহ তথা যে মাসআলা বা কায়দার উপর ভিত্তি করে তাখরীজ করা হয়েছে তা খুঁজে বের করা হোক। তারপর সেই মাসআলার দলীল কুরআন ও হাদীসে দেখা হোক। সেই মাসআলার যে দলীল হবে মুখাররাজ মাসআলারও সেই দলীল হবে। এটিই মুখাররাজ মাসআলার দলীল জানার সঠিক পদ্ধতি। সঠিক পদ্ধতি ব্যতীত অন্যভাবে জানতে চাইলে শ্রম ও মেধা ব্যয় হবে; কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছা যাবে না। এ কারণেই আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ. দাহ দর দাহ সম্পর্কে বলেন:

ومن لم يتقنه وظن أنه مذهب صاحب المذهب تعسر عليه الأمر في تأصيله على أصل شرعي معتمد عليه.

সর্বোপরি, ফিকহ ও ফতওয়া বিষয়ে গভীরতা অর্জন করতে চাইলে একজন তালিবে ইলমকে অবশ্যই তাখরীজে ফিকহী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখতে হবে।

দুই. যথাযথরূপে ফতওয়া প্রদানের জন্য

ফতওয়ার অর্থই হলো, تنزيل الحكم الكلي على الوافعة الجزئية। এই তানযীলটা সঠিকরূপে হওয়ার জন্য একজন মুফতিকে বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে হয় এবং বিশ্লেষণ করতে হয়। কখনও শক্ত ভাষায় কখনও বা নরম ভাষায় ফতওয়া লিখতে হয়। এমনকি প্রয়োজনে মারজুহ ও যঈফ কওলের উপরেও ফতওয়া দিতে হয়। যদি তাখরীজে ফিকহী সম্পর্কে যথাযথ জানা না থাকে, তার জন্য ফতওয়ার উসূল ও রুসূম রক্ষা করা কঠি;: বরং অসম্ভব বটে।

বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম এ বিষয়ে লক্ষ রাখেন। কোনো মাসআলায় জটিলতা সৃষ্টি হলেই তারা মাসআলার তাবাকার খোঁজখোবর নেন। এটি যাহিরুর রিওয়ায়া নাকি মুখাররাজ ফতওয়া ও ওয়াকিআত-ইত্যাদি খুঁজে বের করেন। সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার পর ফতওয়া প্রদান করেন। অপরদিকে অনেকেই এতো কিছু লক্ষ করেন না। যার কারণে যা হওয়ার তাই হতে থাকে...।

তিন. ইমামগণের নাযিলা সংক্রান্ত কর্মপন্থা জানার নিমিত্তে

নাওয়াযিল ও আধুনিক মাসআলা নিয়ে যুগে যুগে অনেক ফকীহ কাজ করেছেন। নিজের সকল শ্রম ব্যয় করে আমাদের সহজার্থে সমাধান বের করে দিয়ে গেছেন। এখনও যে সকল মাসআলা নতুনরূপে দেখা দিচ্ছে তা নিয়ে বর্তমানের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম কাজ করছেন। সমাধান প্রদান করছেন। তাঁদের কাজের বড় একটি অংশ জুড়ে আছে তাখরীজে ফিকহী। হাজার/বারশ বছর ধরে এভাবে ফিকহের চর্চা চলে আসছে। বিষয়টিকে মোটেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই; বরং সুবিশাল অবদান তাঁদের। আমরা দরসে উসূলুল ফিকহ পড়ি। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদের তরীকা ও উসূল জানার জন্য। স্বীকৃত কথা যে, কয়েকটি উসূলের কিতাব পড়লেই কেউ মুজতাহিদ বনে যায় না। তারপরও পড়ানো হয় ইজতিহাদের উসূল জানার জন্য এবং মুজতাহিদ ইমামের তরীকা ও মানহাজ জানার জন্য। অন্যদিকে তাখরীজে ফিকহীর চর্চা হাজার বছর ধরে আমাদের মাযহাবে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভবিষ্যতে হবে। বিজ্ঞজন এখনও চর্চা করছেন। কিন্তু আমরা তাখরীজের উসূল ও তরীকা সম্পর্কে পড়ি না। প্রয়োজনও বোধ করি না।

যারা আধুনিক মাসআলার সমাধান বের করছেন তারা সঠিক বলছেন কি না- তা তো বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার

করবেন। তবে তাঁরা কীভাবে কাজ করে থাকেন এতটুকু তো জানা একজন তালিবে ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই নাওয়াযিল ও আধুনিক মাসআলার তরীকায়ে ইসতিখরাজ জানার জন্য হলেও তাখরীজে ফিকহী সম্পর্কে পড়া উচিত।

চার. ফিকহুন নাওয়াযিলে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য

পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, যুগের সাথে সাথে মাসআলারও পরিবর্তন ঘটে। নতুন নতুন মাসআলা সামনে আসতেই থাকে। যার কারণে প্রত্যেক যুগে কিছু যোগ্য ফকীহ এমন থাকা উচিত, যারা তাখরীজের মাধ্যমে আধুনিক নাযিলার সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম। তাখরীজে ফিকহীর চর্চা না থাকলে তো এমন ব্যক্তি তৈরি হবে না। নাযিলা পর্যায়ের কোনো মাসআলা দেখা দিলে সঠিক সমাধানের তরীকা জানা না থাকলে অনেকেই ভুল সমাধান দিয়ে দিবে।

ফতওয়ার ইখতিলাফ আরও বেড়ে যাবে। এতে শরীআ নিয়ে অন্যরা মন্তব্য করার সুযোগ পাবে। শরীআর উপযোগিতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

সর্বোপরি, তাখরীজে ফিকহীর গুরুত্ব বর্তমান যামানায় অপরিসীম। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়। খুবই সংক্ষেপে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো। আশা করি, ফিকহের তালিবে ইলম ভায়েরা-এ দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিবেন। আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শে মুতালাআ করবেন। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

[প্রবন্ধটি শায়খের 'তাখরীজে ফিকহীর গুরুত্ব' বিষয়ক সারগর্ভপূর্ণ মুহাযারা অবলম্বনে লেখা হয়েছে। এবং শায়খের নযরে সানীর পর পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো। -গবেষণা ও রচনা বিভাগ]

দ্বিমাসিক তিলমীয
বর্ষ: ০১, সংখ্যা: ০১